লৌকিক বা সরল বস্তুবাদ (Naive Realism)

জ্ঞাতার মননিরপেক্ষভাবে একটি বাহ্য জগৎ আছে এবং সেই জগৎকে ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতায় জানা যায়—এই অভিমত সরল বা লৌকিক বস্তুবাদ নামে পরিচিত। বস্তুবাদের এই শাখাকে সরল বলা হয় কারণ সাধারণ মানুষ প্রবৃত্তিবশত যা বিশ্বাস করে এই মতবাদে তারই প্রতিফলন হয়েছে। সাধারণ মানুষ মনে করে যে জগৎ তার বহিঃস্থিত এবং তাকে সাক্ষাৎভাবে জানা যায়। এই লৌকিক মতকে সরল বলার কারণ এই যে এখানে দার্শনিক যুক্তি বা বিচারের কোন স্থান নেই। দার্শনিক বিচার থেকে মুক্ত বলে এই বস্তুবাদকে Naive বা সরল বলা হয়।

হসপার্স সরল বস্তুবাদের মূল বক্তব্যকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থিত করেছেন ঃ

১. আমার বাইরে গাছপালা-নদী-পাহাড় প্রভৃতি নিয়ে একটি ভৌত জগৎ আছে।

২. এই বস্তুজগৎ সম্বন্ধে আমরা যা কিছু বলি তার সত্যতা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা দিয়ে জানা সম্ভব। 'টেবিলটি বাদামী', 'জল শীতল', 'মধু সুস্বাদু'—এই জাতীয় বচনের সত্যতাকে অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করা যায়।

৩. এই বস্তুগুলিকে যখন দেখি তখনই যে শুধুমাত্র তাদের অস্তিত্ব থাকে তা নয়, তাদের যখন দেখি না তখনও তাদের অস্তিত্ব থাকে।

৪. আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জগৎকে যথাযথভাবে প্রত্যক্ষ করি। জ্ঞান যেন একটি আলোকবর্তিকা। আলো বাহ্যবস্তুর উপর পড়লে সেই বস্তু অবিকৃতভাবে প্রকাশিত হয়। জ্ঞানও যে বস্তুকে প্রকাশ করে তাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করে। আমরা জগৎকে জানি এই দাবি বৈধ।

৫. তাছাড়া আমরা মনে করি যে জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বাহ্য বস্তুর দ্বারাই উৎপন্ন হয়। আমরা এই জ্ঞানের জনক নই।

সরল বস্তুবাদ মনে করে যে জগৎকে আমরা সাক্ষাৎভাবে জানি। একথার তাৎপর্য এই যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে একদিকে জ্ঞাতা ও অপরদিকে জ্ঞেয়বস্তু থাকে। তাদের সংযোগে জ্ঞান হয়। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়বস্তুর মধ্যে তৃতীয় কোন পদার্থ নেই। জ্ঞানের এই প্রক্রিয়াকে 'Two-term process' বা দ্বিপদী প্রক্রিয়া বলা হয়।

সরল বস্তুবাদের প্রতিটি বক্তব্যই দার্শনিকের সমালোচনার বিষয় হয়েছে। যে সমস্ত যুক্তির দ্বারা সরল বস্তুবাদকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে তাদের মধ্যে কয়েকটি প্রধান যুক্তির উল্লেখ করা হল।

১. আমরা যা প্রত্যক্ষ করি তা বস্তুর অনুরূপ—এই দাবি সম্ভবত সত্য নয়। তার কারণ আমরা যা প্রত্যক্ষ করি তা আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যেমন আমাদের চোখ যদি অন্যরকম হত তাহলে আমরা সাধারণভাবে যা দেখি তাও অন্যরকম হত। জিভ দিয়ে আমরা যে আস্বাদ পাই তাও অন্যরকম হত যদি জিভের স্বাদকেন্দ্রগুলি অন্যরকম হত। সুতরাং বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষ করি তা অনেকাংশে নির্ভর করে আমাদের ইন্দ্রিয়ের গঠন বা প্রকৃতির উপর। একথা বিজ্ঞানসম্মত। এখন একথা যদি সত্য হয় তাহলে আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব হবে না যে আমরা একটি বস্তুকে যথাযথভাবে প্রত্যক্ষ করি অথবা বস্তুর আস্বাদকে যথাযথভাবে গ্রহণ করি। তার চেয়েও বড় কথা এই যে বাস্তবিক একটি বস্তুর স্বরূপ কি বা একটি বস্তু স্বরূপত কেমন তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আমরা যে বস্তুকে জানি তা যদি অনেকাংশে ইন্দ্রিয়নির্ভর হয় তাহলে ইন্দ্রিয় বা প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষভাবে বস্তুর স্বরূপ কি তা আমাদের অজানা থেকে যাবে। দুটি চোখ যা দেখে তা যদি একটি প্রতিরূপে মিলিত না হত, তাহলে আমরা সবকিছুই দ্বিগুণ দেখতাম। হসপার্স এই প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্তে বলেছেন যে আমাদের দুটি চোখ যদি পশুদের মতো মাথার দুপাশে থাকত তাহলে সম্ভবত বেধ বা গভীরতার প্রত্যক্ষ হত না। আমাদের চোখের রেটিনায় যদি রড ও কোণ (rods and cones) অন্যরকম হত বা নাই থাকত তাহলে বর্ণের প্রত্যক্ষই হত না। অনেক প্রাণীরই বর্ণ সংবেদন হয় না। আবার মাছিরা আলট্রাভায়োলেট প্রত্যক্ষ করতে পারে যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

একইভাবে আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় এবং স্পর্শেন্দ্রিয় অবশ্যই অন্যরকম হতে পারত। আবার আমাদের যদি অতিরিক্ত আরও কিছু ইন্দ্রিয় থাকত তাহলে আরও কত কিছু যে আমাদের কাছে প্রকাশিত হত তা আমরা কল্পনা করতেও পারি না। যে বিশ্বকে আমরা এখন যেভাবে জানছি তখন হয়তো তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বিশ্ব আমাদের কাছে প্রকাশিত হত।

কিন্তু আমরা যে ইন্দ্রিয় নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি তাদের সাহায্যেই জগৎকে জানতে হবে। প্রকৃতির দান এই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আমরা পরিবর্তন করতে পারি না। তাই আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষ করি তা আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপরই নির্ভর করবে। আমরা যেহেতু নিজেদের ইন্দ্রিয়কে পরিত্যাগ করতে পারি না তাই আমরা কখনই নিশ্চিত হতে পারি না যে আমরা বিশ্বকে তার স্বরূপে জানছি।

২. বাস্তবে আমাদের যে সমস্ত ইন্দ্রিয় আছে তার মাধ্যমেও আমরা জগৎকে যথাযথভাবে জানতে পারি কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। আমরা কখনও কখনও দড়িকে সাপ বলে জানি। জলে অর্ধনিমজ্জিত ঋজু কাঠিকে আমরা বক্র দেখি। দুটি সমান্তরাল রেললাইন দূরে মিশে গিয়েছে বলে মনে হয়। দূরে পাহাড়ের গায়ে গাঢ় সবুজ গাছকে নীলাভ বলে দেখা যায়। বরফ জলে হাত ঠাণ্ডা করার পরে কবোষ্ণ জলও সেই হাতে গরম বলে মনে হয়। এই সমস্ত প্রত্যক্ষই ভ্রান্ত। আমরা বাহ্য বস্তুকে সাক্ষাৎভাবে জানি একথা দাবি করলে সাপ, বক্র কাঠি, অথবা দূরে মিশে যাওয়া রেললাইনকেও বাস্তব বলতে হবে। যেহেতু ইন্দ্রিয় আমাদের মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত করে তাই স্বীকার করতে হবে যে যা বাস্তব এবং যা আমাদের কাছে অবভাসিত তার মধ্যে ব্যবধান আছে। যা বাস্তব নয় আমরা তাকেও কখনও কখনও প্রত্যক্ষ করি।

৩. ভ্রম-প্রত্যক্ষে বিষয়ের বিকৃতি ঘটে। কিন্তু সেখানে বিষয় হিসাবে কোন না কোন বস্তু উপস্থিত থাকে। কিন্তু কখনও কখনও এমন বিষয় আমাদের কাছে প্রতীত হয় বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব নেই। এই জাতীয় ভ্রম-প্রত্যক্ষকে অমূল প্রত্যক্ষ (hallucination) বলে। ভ্রমে সাপ না থাকলেও দড়ির অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু অমূল প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বস্তুর অস্তিত্ব না থাকলেও তার প্রত্যক্ষ হয়। চোখের রোগে মানুষ শূন্য আকাশে কেশগুচ্ছ দেখে। যে পা কেটে ফেলা হয়েছে সেই পায়ে যন্ত্রণা বোধ করে। এসবই অমূল প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্ত।

ভ্রম-প্রত্যক্ষের তুলনায় অমূল প্রত্যক্ষের সমস্যাটি আরও গভীর। কারণ ভ্রম-প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে যদিও আমরা কোন বস্তুকে বিকৃতভাবে দেখি এবং আমরা যা দেখি তা আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, তাহলেও আমার সামনে

কোন একটি বস্তু থাকে যাকে আমি প্রত্যক্ষ করতে চাই। কিন্তু অমূল প্রত্যক্ষে যার অস্তিত্ব আমার সামনে নেই তাকেই যেন দেখছি বলে মনে হয়।

৪. উপরোক্ত কারণের জন্য বাহ্য জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ি। ইন্দ্রিয় কখনও কখনও আমাদের প্রতারণা করে। কিন্তু ইন্দ্রিয় কখন আমাদের প্রতারণা করছে এবং কখন প্রতারণা করছে না ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষভাবে তা জানার কোন উপায় নেই। ইন্দ্রিয় যে সর্বদাই আমাদের প্রতারণা করছে না অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান দিচ্ছে না সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না। জগৎ সম্পর্কে আমরা যা জানি তা নিশার স্বপনের মতো এক বিরাট অমূল প্রত্যক্ষ হতে পারে। তৃষ্ণার্ত পথিকের কাছে মরুভূমিতে মরীচিকা আবির্ভূত হয়ে কিছুক্ষণ পরে সহসা অদৃশ্য হয়ে যায়। এই বিশ্বভ্রম আরও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে—এরকম কল্পনা অমূলক নয়।

দেকার্তের দার্শনিক অনুধ্যানে এই সংশয়ের স্বাক্ষর আছে। তিনি বলেছিলেন যে প্রত্যক্ষে আমি কখনও কখনও বিভ্রান্ত হই একথা অনস্বীকার্য। এই বিভ্রান্তি যৌক্তিক দিক থেকে সর্বব্যাপক হতে পারে যার অর্থ হল আমার সকল প্রত্যক্ষই বিভ্রান্তিকর হতে পারে। আমি বিশ্বজগৎকে প্রত্যক্ষ করছি বলে মনে করলেও জগতের অস্তিত্ব নাও থাকতে পারে। দেকার্ত তাই বলেছিলেন যে আমার সামনে যে বাস্তবিক একটি টেবিল আছে একথা আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। শুধু টেবিল নয় জাগতিক সমস্ত বস্তুই আমার সংশয়ের বিষয় হতে পারে। সমস্ত সংশয়ের মধ্যে সংশয়ের কর্তারূপে একমাত্র আমার অস্তিত্বই সংশয়াতীত।

আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞাতৃনিরপেক্ষ বাহ্য জগৎকে জানি—সরল বস্তুবাদের এই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নয়। দার্শনিক যুক্তি সরল বস্তুবাদকে সমর্থন করে না। এর ফলে বস্তুবাদ একটি নতুন আকার ধারণ করে যার নাম 'প্রতিরূপী বস্তুবাদ' (Representative Realism)।

প্রতিরূপী বস্তুবাদ (Representative Realism)

প্রতিরূপী বস্তুবাদের প্রধান প্রবক্তা জন লক (১৬৩২-১৭০৪)। লকের মতে প্রত্যক্ষনিরপেক্ষভাবে ভৌত বস্তুর বাহ্য অস্তিত্ব আছে। কিন্তু যেভাবে বস্তু আমাদের কাছে প্রতীত হয় তা বস্তুর স্বরূপ থেকে ভিন্ন, অর্থাৎ আমরা কোন বস্তুকেই তার স্বরূপে জানি না। লকের মতে আমরা যে জগৎকে জানি সেই জগৎ শুধুই নানা গুণের সমষ্টি। আমরা হয় শ্বেতত্ব, নীলত্ব প্রভৃতি বর্ণকে জানি, অথবা কাঠিন্য, কোমলতাকে জানি, বা মিষ্টত্ব, কটুত্ব প্রভৃতি গুণকে জানি। তাছাড়াও আমরা জানি

বিস্তৃতি, গতি বা আকৃতিকে—যা গুণ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা সাধারণ ভাষায় বলি—আমি একটি গাছকে প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনুভবে যা পাই তা একটি বিশেষ আয়তন ও আকৃতি, সবুজত্ব, কাঠিন্য প্রভৃতি। লকের মতে এই গুণগুলি সমজাতীয় নয়। তিনি গুণকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—মুখ্য গুণ (primary quality) এবং গৌণ গুণ (secondary quality)।

লক তাকেই মুখ্যগুণ বলেছেন যে গুণগুলি বস্তুর নিজস্ব, যাদের অস্তিত্ব আমাদের প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে না। জগতে যদি কোন সংবেদনশীল প্রাণী বা জ্ঞাতা নাও থাকত তাহলেও বস্তুতে এই গুণগুলি আশ্রিত থাকত। কোন ব্যক্তি যদি বাহ্য বস্তুকে নাও প্রত্যক্ষ করে তাহলেও সেই বস্তুর একটি নির্দিষ্ট আয়তন, আকৃতি ও ওজন থাকবে। এই ধর্মগুলিকে তাই বস্তুগত বলা হয়। লক এই প্রত্যক্ষনিরপেক্ষ এবং বস্তুগত গুণকেই মুখ্য গুণ বলেছেন।

আবার আমরা এমন কিছু কিছু গুণকে জানি যা বাস্তবিক বস্তুগত নয়। এইসব গুণের প্রত্যক্ষ অনেকাংশে আমাদের ইন্দ্রিয় ও দৈহিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। লক তাদের গৌণ গুণ (secondary quality) বলেছেন। বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ এবং স্পর্শগুণের যে ধারণা আমাদের হয় তা বাহ্য বস্তুর নিজস্ব ধর্ম নয়। একই বর্ণ বিভিন্ন আলোতে বিভিন্নরকম বলে মনে হয়। সুতরাং বর্ণ যে বাহ্য পরিবেশের অন্তর্গত তা বলা যায় না। যে ব্যক্তি বর্ণান্ধ তার কোন বর্ণের প্রত্যক্ষ হয় না, যদিও অন্য ব্যক্তি তা প্রত্যক্ষ করে। জন্ডিস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সাদা দেওয়ালকে হলুদ দেখে।

গন্ধ, স্বাদ ও স্পর্শগুণ সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। এই সমস্ত গুণের প্রত্যক্ষ আমাদের ইন্দ্রিয়ের অবস্থার উপর নির্ভর করে। স্বাভাবিক অবস্থায় কফির যে স্বাদ আমরা পাই কোন সুমিষ্ট বস্তু খাবার পর সেই আস্বাদ পাই না। সুতরাং সঙ্গত-ভাবেই এ প্রশ্ন করা যেতে পারে যে আমরা এই সমস্ত গুণের যে ধারণা লাভ করি তা কি বস্তুগত? বাহ্য বস্তুর কি কোন নিজস্ব গন্ধ, স্বাদ বা বর্ণ আছে?

লক অবশ্য গৌণ গুণকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিসাপেক্ষ বলে মনে করেননি। আমরা ঘাসে যে হরিৎ বর্ণ দেখি তা আমাদের চোখের সৃষ্টি নয়। গোলাপে যে সৌরভের আঘ্রাণ পাই তা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি নয়। গৌণ গুণ ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল হলেও তা জ্ঞাতার ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি নয়। গৌণ গুণেরও বাস্তব ভিত্তি আছে, যদিও তার ফলে তাকে বস্তুগত বলা চলে না। কিন্তু গৌণ গুণ বস্তুগত না হলেও বস্তুর মধ্যে এমন একটি শক্তি আছে যা আমাদের ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করতে পারে যার ফলে নানা গুণের সংবেদন হয়। তবে বাহ্য বস্তুর মধ্যে এই শক্তি থাকলেই যে

ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হবে এবং বর্ণ প্রভৃতির সংবেদন হবে তা নয়। যেমন, আমরা যখন অন্ধকারে থাকি তখন বাহ্য বস্তু তার অন্তর্নিহিত শক্তির সাহায্যে আমাদের ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করতে পারে না। আবার যে ব্যক্তি বর্ণান্ধ তার ইন্দ্রিয়ও এইভাবে উদ্দীপিত হয় না। অতএব আমাদের যে বর্ণ বা গন্ধের সংবেদন হয় তার জন্য ইন্দ্রিয়ও দায়ী। তাই বর্ণ, গন্ধ প্রভৃতির সংবেদন অনেকটাই ব্যক্তিসাপেক্ষ। এইসব সংবেদনের ভিত্তিতে জগৎকে বর্ণময় বা গন্ধময় বলা যায় না। হসপার্স লকের বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে গৌণ গুণ বস্তুর নিজস্ব গুণ নয়। বস্তুর মধ্যে শুধু ধারণা বা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা উৎপন্ন করার শক্তি (power) আছে। বস্তুর নিজস্ব কোন বর্ণ নেই, কিন্তু দ্রষ্টার মধ্যে বর্ণের অভিজ্ঞতা উৎপন্ন করার শক্তি আছে। যে বস্তুকে আমরা লাল বা নীল বলি সেই বস্তুটি স্বরূপত লাল বা নীল নয়। তাদের মধ্যে লাল বা নীল বর্ণের ধারণা উৎপাদন করার শক্তি আছে মাত্র। অর্থাৎ বস্তু এই জাতীয় শক্তির আশ্রয়; লাল বা নীল বর্ণের আশ্রয় নয়। এই বর্ণগুলি আমাদের মনে ধারণা (idea) রূপে থাকে।

সুতরাং গৌণ গুণগুলি যে অভিজ্ঞতার জন্ম দেয় তারা শুধুমাত্র গৌণ অর্থে জ্ঞানের বিষয়ে (object) থাকে, কারণ কোন বস্তুতেই তারা আশ্রিত থাকতে পারে না। এর ফলে আমাদের মনের ধারণার (ideas) মাধ্যমে বস্তুজগৎকে জানা যায় না। তাই গৌণ গুণের ক্ষেত্রে ধারণা ও বস্তুর মধ্যে আনুরূপ্যের প্রশ্ন ওঠে না।

কিন্তু মুখ্য গুণের ক্ষেত্রে আমরা যা জানি তা বস্তুগত। সুতরাং প্রশ্ন করা যেতে পারে যে idea বা ধারণার সঙ্গে মুখ্য গুণের কি জাতীয় সম্পর্ক আছে? বলা হয় যে এই সম্পর্ক আনুরূপ্যের সম্পর্ক। মুখ্য গুণ সম্পর্কে আমাদের ধারণা বস্তুজগতের গুণের অনুরূপ।

এই অনুরূপতা বস্তুবাদের দাবি। কিন্তু বাস্তবিক তা প্রমাণসাপেক্ষ। আমরা দেখেছি যে লকের মতে আমরা যে জগৎকে জানি সেই জগৎ নানা গুণের সমষ্টি। সেই গুণগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে যার ফলে আমাদের মনে তাদের প্রতিরূপের সৃষ্টি হয়। আমাদের মন এই প্রতিরূপকে জানে, সাক্ষাৎভাবে জগৎ বা তার গুণকে জানে না। বাহ্য জগৎ আমাদের মনে যে প্রতিরূপের সৃষ্টি করে তার মাধ্যমে আমরা পরোক্ষভাবে জগৎকে জানি। এইজন্য লকের বস্তুবাদকে প্রতিরূপী বস্তুবাদ (Representative Realism) বলা হয়। এই মতে বহির্জগতের জ্ঞান যেহেতু সাক্ষাৎভাবে হয় না, পরোক্ষভাবে হয় তাই এই মতবাদকে পরোক্ষ বস্তুবাদও (Indirect Realism) বলা হয়। লক এই প্রতিরূপকে মুখ্য গুণের প্রতিরূপ বলেছেন, কারণ গৌণ গুণ আমাদের মনে মুখ্য গুণের মতো ধারণা সৃষ্টি

করলেও তারা বাইরের কোন বস্তুর প্রতিরূপ নয়। তাই আমাদের মনের ধারণাকে যদি বাহ্য জগতের প্রতিনিধি বলতে হয়, তাহলে একমাত্র মুখ্য গুণের ধারণা সম্পর্কেই তা বলা যাবে, অর্থাৎ মুখ্য গুণের যে প্রতিরূপ আমাদের মনে উৎপন্ন হয় তার সঙ্গে বস্তুজগতের মিল বা অনুরূপতা থাকে। কারণ মুখ্যগুণ বস্তুর নিজস্ব ধর্ম। আমাদের মনে যদি কোন বস্তুর বিস্তৃতি বা গতির ধারণা থাকে তাহলে সেই ধারণা বা প্রতিরূপের ভিত্তিতে আমরা সেই বস্তুকে বিস্তৃত বা গতিমান বলে মনে করতে পারি। কিন্তু গোলাপকে যখন লাল বলে জানি তখন লাল বর্ণের ধারণাটি একটি গৌণ গুণের ধারণা। কারণ তা আমাদের ইন্দ্রিয়ের অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাই এই ধারণার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি না যে গোলাপ প্রকৃতই লাল। আমরা শুধু অনুমান করতে পারি যে গোলাপে লাল রঙের সংবেদন জন্মাবার শক্তি আছে।

সুতরাং লকের মতে জাগতিক বস্তুমাত্রই গুণের সমষ্টি। গুণ দুপ্রকার—মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ। এই দুপ্রকার গুণ ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার জনক। বিশপ বার্কলে লকের সমালোচকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর মতে মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে লক যে পার্থক্য করেছেন তার কোন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এই বিষয়ে তাঁর প্রধান যুক্তিগুলিকে বিশ্লেষণ করা হল—

প্রথমত, বার্কলে অভিযোগ করেছেন যে মুখ্য ও গৌণ গুণ অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকে। গৌণ গুণ ছাড়া মুখ্য গুণের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। বিস্তৃতি, আকার, গতি প্রভৃতিকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। যেখানেই বিস্তৃতি বা আকার থাকে সেখানেই কোন না কোন বর্ণ থাকতে বাধ্য। বর্ণহীন আকার কল্পনা করা যায় না। সুতরাং যেখানে মুখ্য গুণ থাকে সেখানেই গৌণ গুণ থাকে। এইভাবে যে দুটি গুণ অবিচ্ছেদ্যভাবে থাকে তাদের একটিকে মুখ্য এবং অপরটিকে গৌণ বলা অসঙ্গত। আকার বা বিস্তৃতি মুখ্য গুণ হলে বর্ণকেও মুখ্য গুণ বলতে হবে। আর বর্ণ যদি গৌণ গুণ হয় তাহলে আকার বা বিস্তৃতিও গৌণ গুণ হবে। সুতরাং গুণের এই বিভাগ যুক্তিহীন।

দ্বিতীয়ত, লকের মতে গৌণ গুণ ব্যক্তিসাপেক্ষ কারণ তা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। এখন প্রত্যক্ষের বিভিন্নতা যদি ব্যক্তিসাপেক্ষতার প্রমাণ হয়, অর্থাৎ এই বিভিন্নতা যদি প্রমাণ করে যে বস্তুটি ঐ সমস্ত ধর্মের অধিকারী নয়, তাহলে লকের যুক্তি শুধু গৌণ গুণ নয়, মুখ্য গুণকেও ব্যক্তিসাপেক্ষ বলে প্রমাণ করবে। কারণ বর্ণ, গন্ধ প্রভৃতি গৌণ গুণের প্রত্যক্ষই যে ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয় তা নয়, আকৃতি, বিস্তার প্রভৃতি তথাকথিত মুখ্য গুণের প্রত্যক্ষেরও ব্যক্তিভেদে পরিবর্তন হয়।

বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে একই বস্তু বিভিন্ন আলোয় বিভিন্ন বর্ণের বলে মনে হয়। কিন্তু একইভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বস্তুর আকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হয়। একই মুদ্রাকে উপর থেকে দেখলে গোলাকার দেখায়, পাশ থেকে দেখলে ডিম্বাকার দেখায়। তাছাড়া বস্তুর আয়তনও দ্রষ্টার সঙ্গে তার দূরত্বের উপর নির্ভর করে। পর্বতের যে বিশাল আয়তন আমরা কাছ থেকে দেখি, দূর থেকে সেই আয়তন দেখি না। তাহলে আকৃতি ও আয়তনকে গৌণ গুণ বলাই কি সঙ্গত বলে মনে হয় না?

লকের বিরুদ্ধে বার্কলের এই যুক্তিকে প্রতিহত করা সম্ভব। বলা যেতে পারে যে বাহ্য বস্তুর অবশ্যই নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন আছে, কিন্তু এই আকার ও আয়তন দ্রষ্টার নির্দিষ্ট অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝতে হবে। একটি মুদ্রা অবশ্যই গোলাকার যদি তা উপর থেকে দেখা যায়। সেই মুদ্রাই ডিম্বাকার যদি পাশ থেকে দেখা যায়। সামান্য দূরত্ব থেকে যদি দেখা যায় তাহলে একটি বস্তুকে অবশ্যই বিশাল বলতে হবে, সেই বস্তুই ক্ষুদ্র যদি বহু দূর থেকে তাকে দেখা যায়।

কিন্তু এ সমস্ত কথা বিশেষ গ্রাহ্য বলে মনে হয় না। বরং একথা অনেক বেশি গ্রাহ্য মনে হবে যদি বলা হয় যে একটি বস্তুর নিজস্ব আকৃতি ও আয়তন আছে, তবে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে তা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হতে পারে। বর্ণ সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য হবে। একটি বস্তু বাস্তবিক লাল রঙের, তবে সবুজ কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখলে সেটিকে ধূসর দেখায়। দূরের পাহাড়ে গাছপালা বাস্তবিক সবুজ, কিন্তু অনেক দূর থেকে দেখলে সেগুলি নীলাভ-ধূসর দেখায়। কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে বা কোন্ অবস্থান থেকে একটি বস্তুর বর্ণ কিভাবে আমাদের কাছে প্রতীত হবে তা আগে থেকেই বলা যায় কারণ বিষয়টি নির্দিষ্ট নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাছাড়া একটি বস্তুর আকার বা আয়তনের পরিবর্তন আদৌ বোধগম্য নয়। একটি বস্তু সামনে থেকে বড় বলে মনে হলে দূর থেকে সেই একই বস্তু কিভাবে ছোট হতে পারে। বস্তুটি হয় বড় না হয় ছোট। বস্তুটির পক্ষে নিজস্ব আয়তন পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তর্কের স্বার্থে একথা হয়ত বলা চলে যে বস্তুটি তার আকার বা আয়তন পরিবর্তন করে। দ্রষ্টার অবস্থান ভেদে এই পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু এখানেও সমস্যা আছে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে একাধিক দ্রষ্টা যদি ভিন্ন ভিন্ন দূরত্ব থেকে একই বস্তুকে প্রত্যক্ষ করে তাহলে বস্তুটির আয়তন সম্পর্কে আমরা কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব? বস্তুটি একই সঙ্গে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র হতে পারে না।

সুতরাং বস্তুর যে আকার এবং আয়তন আমাদের কাছে প্রতীত হয় তা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন। বর্ণ, গন্ধ প্রভৃতির প্রতীতির সঙ্গে এর কোন পার্থক্য নেই। একটি বস্তু অপর

একটি বস্তুর তুলনায় বড় বলে মনে হতে পারে, বাস্তবে একথা হয়তো সত্য নয়। একই বস্তুর বিভিন্ন গুণ সম্বন্ধে ব্যক্তিভেদে প্রতীতিভেদের অজস্র দৃষ্টান্ত আছে। উষ্ণ জলে যে হাতটি কিছুক্ষণ নিমজ্জিত ছিল সেই হাতটি ঠাণ্ডা জলে ডোবালে তা অনেক বেশি ঠাণ্ডা বলে বোধ হয়। সাধারণ অবস্থায় সেই জলই হয়ত উষ্ণ বলে বোধ হবে। সাধারণ অবস্থায় যে বাতাস উষ্ণ বলে বোধ হয় জ্বরাক্রান্ত শরীরে তাই শীতল বলে বোধ হয়। এই লৌকিক দৃষ্টান্তগুলি আমাদের সকলেরই অতি পরিচিত। এর ফলে আমরা তত্ত্ব ও অবভাসের মধ্যে পার্থক্য করতে শিখেছি। আমরা বিশ্বাস করি যে একটি বস্তুর বর্ণ, গন্ধ বা আস্বাদ বিভিন্নভাবে অবভাসিত হতে পারে। তবুও অবভাস বা প্রতীতির ভিন্নতা সত্ত্বেও আমরা বিশ্বাস করি যে বস্তুটির নিজস্ব বর্ণ, গন্ধ বা আস্বাদ আছে। এইভাবে বস্তুর স্বরূপগত গুণ ও প্রতীত গুণের মধ্যে পার্থক্য করা যেতে পারে। গোলাপটি স্বরূপত লাল, মুদ্রাটি স্বরূপত গোলাকার। কিন্তু তাদের এই গুণগুলি অন্যভাবে প্রতীত হতে পারে।

ব্যক্তিভেদে বস্তুর গুণের প্রতীতির এই পরিবর্তন যদি একথা প্রমাণ করে যে বস্তুর নিজস্ব কোন গুণ নেই তাহলে বস্তুকে গুণহীন বলতে হবে। আমরা যে গুণগুলিকে প্রত্যক্ষ করি তাদের কোনটিই বস্তুতে আশ্রিত নয়। গৌণ গুণ সম্পর্কেই যে একথা সত্য তা নয়, সকল প্রকার গুণ সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তত্ত্ব ও অবভাসের মধ্যে যে পার্থক্য আমরা করে থাকি তা মিথ্যা হয়ে যাবে অর্থাৎ আমাদের পক্ষে আর একথা বলা সম্ভব হবে না যে কোন্ কোন্ গুণ বস্তুগত এবং কোন্ কোন্ গুণ অবভাসিত।

এই আলোচনার ভিত্তিতে মুখ্য ও গৌণ গুণের পার্থক্য ভিত্তিহীন বলে মনে হয়। ব্যক্তিভেদে গুণের ধারণার বিভিন্নতা যদি প্রমাণ করে যে বাহ্যবস্তুর কোন বর্ণ নেই তাহলে একই যুক্তি একথা প্রমাণ করবে যে তার কোন আকৃতিও নেই।

লক কখনও কখনও পরিমাপযোগ্যতাকে (measurability) মুখ্য গুণের লক্ষণ বলেছেন। তিনি মনে করেছিলেন যে আকৃতি, আয়তন প্রভৃতি মুখ্য গুণগুলির পরিমাণ পরিমাপ করা যায়। কিন্তু বর্ণ প্রভৃতিকে পরিমাপ করা যায় না। লকের যুগে বিজ্ঞান যথেষ্ট উন্নত ছিল না। বিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে আয়তন বা ওজনকে পরিমাপ করা যায়, বর্ণ পরিমাপের যোগ্য নয়। কিন্তু আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীর মতে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিমাপ করে বর্ণের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব। বিভিন্ন গন্ধের মধ্যে পার্থক্যকেও পরিমাণগতভাবে প্রকাশ করা যায়। সুতরাং পরিমাপযোগ্যতা দিয়ে মুখ্য গুণকে গৌণ গুণ থেকে পৃথক করা যায় না।

মুখ্য ও গৌণ গুণের পার্থক্য যে মিথ্যা একথা অন্যভাবেও প্রমাণ করা যায়। 'বর্ণ' শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে। এক অর্থে আমরা 'বর্ণ' বলতে বর্ণ সংবেদন

বা বর্ণের অভিজ্ঞতাকে বুঝি। অপর অর্থে এই একই শব্দ বর্ণের অভিজ্ঞতার ভৌত কারণকে বোঝাতে পারে, যেমন বস্তু থেকে আগত বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো যা আমাদের চোখে পৌছায়। পদার্থবিদ একেই বর্ণ বলেন। সুতরাং বর্ণ সংবেদনের একটি ভৌত অনুষঙ্গ আছে। শব্দ এবং গন্ধ সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়।

তথাকথিত মুখ্য গুণ সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। আকৃতি ও আয়তনের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি বস্তুরও একটি আকৃতি ও আয়তন আছে। মুদ্রার গোলাকৃতির অভিজ্ঞতার মতো বস্তুজগতের মুদ্রারও গোল আকৃতি আছে। সুতরাং বর্ণের অভিজ্ঞতার মতো যেমন বাস্তব জগতে বস্তুর বর্ণ থাকে সেইরকম আকৃতি ও আয়তনের অভিজ্ঞতার মতো বাস্তব জগতেও বস্তুর আকৃতি ও আয়তন থাকে। এইদিক থেকে বিচার করলে মনে হয় মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয় গুণেরই ভৌত ও সাংবেদনিক পরিচয় আছে। অন্যভাবে বলা যায় যে সমস্ত গুণেরই মুখ্য ও গৌণ এইরকম দুটি দিক। গুণের ভৌত পরিচয় তার মুখ্য গুণকে বোঝায়। গুণের সাংবেদনিক পরিচয় তার গৌণ গুণকে বোঝায়।

আসলে একথাই সত্য যে বর্ণ, গন্ধ, আকৃতি বা আয়তন একদিকে বস্তুর ধর্ম এবং অপরদিকে সংবেদন বা অভিজ্ঞতার ধর্ম। আমরা কখনও কখনও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করি। আকৃতি এবং আয়তনকে ভৌত অর্থে গ্রহণ করে যদি বর্ণ, গন্ধ প্রভৃতিকে সাংবেদনিক অর্থে গ্রহণ করি তাহলে প্রথম শ্রেণীর গুণগুলি মুখ্য বলে মনে হবে এবং বর্ণ, গন্ধ প্রভৃতি গুণগুলি গৌণ বলে মনে হবে। বিভিন্ন গুণের মধ্যে এইরকম অর্থগত বৈষম্য করার জন্য মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে প্রভেদের সৃষ্টি হয়। আমরা যদি বর্ণ, গন্ধ প্রভৃতিকে ভৌত অর্থে গ্রহণ করি তাহলে এই গুণগুলিও মুখ্য বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। আসলে সবরকম গুণকেই ভৌত ও সাংবেদনিক অর্থে নেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে কোন কোন গুণকে মুখ্য বলা এবং কোন কোন গুণকে গৌণ বলা অর্থহীন হয়ে পড়ে। গুণের ক্ষেত্রে আমরা যদি কোন পার্থক্যের কথা বলতে পারি তা হল ভৌত গুণ (physical qualities) এবং সাংবেদনিক গুণের (sensible qualities) মধ্যে পার্থক্য।

তৃতীয়ত, লক বাহ্য জগৎকে গুণের সমাহার বলেছেন। তাহলেও বিভিন্ন গুণের যে সংবেদন বা ধারণা আমাদের হয় তার মধ্যে সবরকম গুণের সংবেদন বাহ্য জগতের গুণের অনুরূপ নয়। লকের মতে কেবলমাত্র মুখ্য গুণের সংবেদনের সঙ্গে বস্তুগত ধর্মের সাদৃশ্য বা অনুরূপতা আছে। কিন্তু গৌণ গুণ সম্বন্ধে আমাদের যে সংবেদন তা বস্তুগত ধর্মের প্রতিচ্ছবি নয়, অর্থাৎ এইরকম কোন গুণ বাহ্য বস্তুতে থাকে না। বস্তুজগতের সঙ্গে মুখ্য গুণের আনুরূপ্য এবং গৌণ গুণের আনুরূপ্যের অভাব এই দুপ্রকার গুণের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি।

লক মুখ্য গুণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বাস্তবের মুখ্য গুণের আনুরূপ্যের কথা বলেছেন। কিন্তু এই আনুরূপ্যকে আমরা কিভাবে জানতে পারি? বিচার করলে দেখা যাবে যে অভিজ্ঞতার বিষয় ও বাস্তব বিষয়ের মধ্যে আনুরূপ্যের কল্পনা নিতান্তই অলীক। তার কারণ, দুটি গুণকে সদৃশ বা অনুরূপ বলার জন্য তাদের মধ্যে তুলনা করা আবশ্যক হয়। এই তুলনার জন্য দুটি গুণের সঙ্গেই পরিচয় থাকা আবশ্যক। একটি নীল জামা অপর একটি নীল জামার সদৃশ বা অনুরূপ—একথা জানার জন্য দুটি জামাকেই দেখা প্রয়োজন। একই যুক্তিতে একটি গুণের অভিজ্ঞতা যে বাস্তব গুণের অনুরূপ একথা বলার জন্য একদিকে যেমন গুণের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন সেইরকম অপরদিকে বস্তুস্থিত গুণকে জানা প্রয়োজন। অভিজ্ঞতাই যদি আমাদের জ্ঞানের মাধ্যম হয় তাহলে আমরা তাকেই জানতে পারি যা অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত। অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ যদি কোন জগৎ থাকে সেই জগৎ চিরকালই আমাদের অজ্ঞাত থাকবে। তথাকথিত বাস্তব জগৎ অভিজ্ঞতার অতিবর্তী বলেই আমাদের কাছে অলীক। আমরা শুধু আমাদের অভিজ্ঞতাকেই জানতে পারি এবং অভিজ্ঞতা ভিন্ন অন্য কিছুই আমরা জানতে পারি না কারণ অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত তথাকথিত বস্তুনিষ্ঠ গুণকে জানা যেহেতু আমার পক্ষে সম্ভব নয় তাই অভিজ্ঞতায় আমি যে গুণকে জানি তা বস্তুজগতের গুণের অনুরূপ কিনা তাও আমার পক্ষে জানা সম্ভব হতে পারে না। অতএব মুখ্য গুণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বস্তুজগতের কোন গুণের সাদৃশ্য থাকলেও লকের পক্ষে সেই সাদৃশ্যকে জানা সম্ভব নয়।

বার্কলে বলেছিলেন 'An idea can resemble nothing but another idea–' একটি ধারণা বা অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র অপর একটি ধারণা বা অভিজ্ঞতার সদৃশ হতে পারে। আমরা যাকে বাহ্যজগৎ বলি তা লকের বক্তব্য অনুযায়ী চিরকালই অজ্ঞাত থাকবে। বাস্তবিক তার অস্তিত্ব সম্পর্কেও আমরা নিশ্চিত বোধ করতে পারি না। আমরা মনে করতে পারি যে আমাদের বাইরে কোন একটি জগৎ আছে যা অভিজ্ঞতা বা ধারণার জনক। এইভাবে বাহ্য জগৎ আমাদের অনুমেয় বা কল্পিত হতে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে বিরাজমান এই কল্পিত জগৎ আমাদের জ্ঞানের বাইরে থাকবে এবং তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয়মোচন করা কোনভাবেই সম্ভব হবে না।

চতুর্থত, বাহ্য জগৎ সম্পর্কে আমরা যদি সন্দিগ্ধ বোধ করি তাহলে সেই জগৎকে আমাদের অভিজ্ঞতার কারণ বলাও সমীচীন হতে পারে না। লক বাহ্য জগৎকে আমাদের অভিজ্ঞতার কারণ বলেছেন। কিন্তু যে জগতের সঙ্গে আমাদের

সাক্ষাৎ পরিচয় নেই সেই জগতের কারণতা সম্বন্ধে সমস্ত কথাই ব্যর্থ হবে। যে জগতের অস্তিত্বই সন্দিগ্ধ সেই জগতের কারণতাও সন্দিগ্ধ হবে। দুটি বস্তুর মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ জানার জন্য তাদের প্রত্যক্ষ করা প্রয়োজন হয়। কিন্তু যদি কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার জগৎ আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয় এবং বাহ্য জগৎ সর্বদাই প্রত্যক্ষের অগোচর থাকে তাহলে তাদের মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করাও সম্ভব হবে না।

কিন্তু একই সঙ্গে একথাও সত্য যে অভিজ্ঞতার উৎপত্তি অবশ্যই কোন কারণের উপর নির্ভর করবে এবং সেই কারণ অভিজ্ঞতা বহির্ভূত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু অভিজ্ঞতার কারণরূপে বাহ্যজগতের কল্পিত অস্তিত্ব যৌক্তিক সমর্থন লাভ করতে পারে না। আমরা যদি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সংবেদন বা অভিজ্ঞতার সঙ্গেই পরিচিত হই তাহলে যা অভিজ্ঞতার জগতের বহির্ভূত তাকে জানা কখনই সম্ভব হবে না।

এই প্রসঙ্গে হসপার্স টেলিফোন এক্সচেঞ্জের উদাহরণ দিয়েছেন। ধরা যাক্ মানুষের মন একটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এবং মানুষ একজন টেলিফোন অপারেটার। বাইরের জগৎ থেকে তার কাছে নানা বার্তা আসে। তারগুলি সেই বার্তাবাহক। টেলিফোন অপারেটার বার্তার গ্রাহক হলেও বাইরে থেকে যে মানুষ বার্তা প্রেরণ করছে তার সঙ্গে অপারেটারের কোন পরিচয় নেই। সে প্রেরককে দেখে না এবং কণ্ঠের ধ্বনিটুকুই শোনে। অপারেটারের পক্ষে যদি এক্সচেঞ্জের বাইরে যাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে তার পক্ষে প্রেরকের সন্ধান পাওয়া বা তার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হওয়ায় কোন সম্ভাবনা নেই।

হসপার্স তাঁর গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে কার্ল পিয়ারসনের 'The Grammar of Science' থেকে একটি প্রাসঙ্গিক অংশের উল্লেখ করেছেন।

আমরা আমাদের বহিঃস্থিত একটি জগতের কথা বলে থাকি। এই জগৎ নানা বস্তুতে পূর্ণ যাদের স্বাধীন অস্তিত্ব আছে অর্থাৎ যাদের অস্তিত্ব আমার উপর নির্ভর করে না। ইন্দ্রিয়জ ধারণা, আমাদের চিন্তা এবং স্মৃতি সমস্তই যেন আমাদের অন্তর্জগৎকে পূর্ণ করে। এই সমস্ত ধারণা প্রভৃতির মাধ্যমে আমরা বাহ্য জগতের কতটা কাছাকাছি যেতে পারি? আমরা যেন কেন্দ্রীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সেই করণিকের মতো যার পক্ষে বার্তা প্রেরকের কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব নয়। টেলিফোন অপারেটর এমন একজন ব্যক্তি যে কখনও টেলিফোন এক্সচেঞ্জের বাইরে যায়নি, কখনও বার্তা প্রেরককে দেখেনি, অর্থাৎ যে টেলিফোনের তার ছাড়া অন্য কোনভাবে বাইরের জগতের সংস্পর্শে আসেনি। তথাকথিত বাস্তব জগৎকে তার পক্ষে

সাক্ষাৎভাবে জানা সম্ভব নয়। তার এক্সচেঞ্জের কক্ষে টেলিফোনের তারের মাধ্যমে যে বার্তা পৌঁছায় তার সাহায্যে সে বহির্জগতের একটি ধারণা গঠন করে। অফিস কক্ষে আবদ্ধ এই মানুষটির পক্ষে টেলিফোনের কোন গ্রাহককে দেখা বা স্পর্শ করা সম্ভব নয়। আমরা যেন এই বন্দী মানুষটির মতো সংবেদনবাহী স্নায়ুর একপ্রান্তে বসে আছি। তাই আমাদের পক্ষে বাহ্য জগতের কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব নয়। আমরাও ইন্দ্রিয়জ ধারণার সাহায্যে যে বার্তা বা তথ্য পাই তাদের বিশ্লেষণ করি, সঞ্চয় করি এবং তাদের সম্পর্কে আলোচনা করি। কিন্তু আমাদের বাইরে যে স্বরূপসৎ জগৎ থাকতে পারে তার সম্বন্ধে নিতান্ত যৌক্তিক কারণে আমরা অজ্ঞ থাকতে বাধ্য।

ভাববাদ (Idealism)

বার্কলের মতে বাহ্য বস্তুজগতের অস্তিত্ব স্বীকার করা লকের পক্ষে সম্ভব নয়। ভৌত জগতের অস্তিত্ব থাকলেও সেই অস্তিত্বকে জানা যায় না—যার ফলে তাঁর পক্ষে সংশয়বাদকে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। লকের দর্শনে অসঙ্গতি অত্যন্ত স্পষ্ট, কারণ তিনি জগতের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন অথচ সেই জগৎকে জানার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেছেন। যে জগৎকে জানা সম্ভব নয় সেই জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করার কোন ভিত্তি থাকতে পারে না। সুতরাং বাহ্য জগৎ এবং তার গুণাবলীর স্বপক্ষে তিনি যে সমস্ত যুক্তি উপস্থিত করেছেন তা অবৈধ হয়ে পড়েছে।

লকের অভিমতকে উপেক্ষা করে বার্কলে বলেছেন যে আমাদের মনের বহিঃস্থিত জগতের অস্তিত্বকে স্বীকার করার স্বপক্ষে সুদৃঢ় কোন যুক্তি নেই। বাস্তবিক এ বিষয়ে কোন যুক্তিই পর্যাপ্ত নয়। শুধু তাই নয়, বার্কলে মনে করেন যে বাহ্য জগতের অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

আপাতদৃষ্টিতে বার্কলের এই সিদ্ধান্ত অস্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে। বার্কলের বক্তব্য যদি এই হয় যে অরণ্য-নদী-পর্বত অর্থাৎ সমগ্র জগতের কোন অস্তিত্বই নেই তাহলে অবশ্যই তাঁর বক্তব্যকে অস্বাভাবিক বলে মনে হবে—কারণ একথা আমাদের লৌকিক ধারণার অত্যন্ত বিরোধী। কিন্তু বার্কলে বাস্তবিক জাগতিক বস্তুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেননি। তিনি একথাই বলতে চেয়েছেন যে মননিরপেক্ষ কোন বিষয়ের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। মনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করার কোন হেতু নেই। আমরা মনে করি জগতে বৃক্ষ-নদী-পর্বতের স্বাধীন অস্তিত্ব আছে। আমরা এই জগতের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা লাভ করি। আমাদের অভিজ্ঞতা বস্তুজগতের অনুরূপ। বার্কলের মতে জগৎ সম্পর্কিত ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা

ব্যতীত আর কিছুই নেই। ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার অতিবর্তী কোন জগতের অস্তিত্ব যদি বা থাকে তাহলেও আমাদের পক্ষে তাকে জানা সম্ভব নয়। আমরা যেহেতু শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী তাই জগতের অস্তিত্ব বা অভাব উভয়ই আমাদের কাছে একইভাবে মূল্যহীন এবং উপেক্ষণীয়। অভিজ্ঞতার জগৎই আমাদের জগৎ। মন এবং অভিজ্ঞতা ছাড়া স্বাধীন বা নিরপেক্ষভাবে সত্তাবান জগতের অস্তিত্ব নেই যাকে আমার অভিজ্ঞতার জনক বলা যেতে পারে। আমাদের প্রথম পরিচয় নিজস্ব অভিজ্ঞতার জগতের সঙ্গে। এই অভিজ্ঞতার জগতেই আমরা চেয়ার, টেবিল, নদী, পাহাড়কে পাই। তার অতিরিক্ত তথাকথিত টেবিল, চেয়ারের একটি স্বাধীন জগতের অস্তিত্বকে স্বীকার করার কি প্রয়োজন যা অভিজ্ঞতার অতিবর্তী? তাকে স্বীকার না করলেও আমার অভিজ্ঞতার জগৎই আমার বিশ্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। সুতরাং একথাই যুক্তিসঙ্গত যে 'experience-of-the-chair'-এর অস্তিত্বই আছে ; 'the-chair-in-itself'-এর জগতের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন।

এখানে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটি প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। বহির্জগতে চেয়ারের অস্তিত্ব ছাড়া চেয়ারের অভিজ্ঞতা হওয়া কি সম্ভব? আমার বাইরে চেয়ারের অস্তিত্ব আছে বলেই তো আমার চেয়ারের অভিজ্ঞতা সম্ভব হয়েছে। 'চেয়ার'-এর অভিজ্ঞতা—এই কথাটির মধ্যেই এই ইঙ্গিত আছে যে চেয়ার ভিজ্ঞতা থেকে ভিন্ন বা অভিজ্ঞতার অতিবর্তী। সুতরাং শুধুই অভিজ্ঞতার জগৎ সত্য এবং চেয়ারের বাস্তব জগৎ অলীক একথা বলা যায় না।

বার্কলের অভিমতের প্রকৃত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে হসপার্স বলেছেন উপরে যে সমস্যার উল্লেখ করা হয়েছে তার উৎস আমাদের ভাষার মধ্যেই নিহিত। ভাষা আমাদের প্রায়ই বিভ্রান্ত করে এবং অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত জগৎ কল্পনার ক্ষেত্রেও আমরা ভাষার দ্বারা বিভ্রান্ত হই। অভিজ্ঞতার উপকরণকে বর্ণনা করার জন্য সেই বস্তুটির উল্লেখ করা প্রয়োজন হয় অভিজ্ঞতাটিকে যে বস্তুবিষয়ক বলে আমরা সাধারণভাবে বিশ্বাস করি। বস্তুটির উল্লেখ করা হয় নিতান্ত ভাষাগত প্রয়োজনে। বস্তুর উল্লেখ ব্যতীত বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা করা ভাষাগতভাবে অসম্ভব। কোন একটি অভিজ্ঞতাকে অপর একটি অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক করে উল্লেখ করার জন্য বস্তুবাচক শব্দের প্রয়োগ করা ছাড়া অন্য কোন ভাষাগত কৌশল আমাদের জানা নেই। ভাষাগত প্রয়োজনে বস্তুবাচক পদের উল্লেখ অপরিহার্য হলেও তার দ্বারা বস্তুজগতের অস্তিত্ব প্রসক্ত হয় না। একথা মনে করা আবশ্যক নয় যে আমাদের বাইরে এক বস্তুজগৎ আছে যা আমাদের অভিজ্ঞতার জনক। অভিজ্ঞতার বর্ণনায় বস্তুর উল্লেখের দ্বারা আমরা শুধুই অভিজ্ঞতার গুণগত বৈশিষ্ট্যকে

বোঝাই। 'চেয়ারের অভিজ্ঞতা' এই শব্দটি অভিজ্ঞতার গুণগত বৈশিষ্ট্যকে বোঝায়, বহির্জগতে চেয়ারের অস্তিত্বের প্রতি কোন ইঙ্গিত এখানে নেই। বহির্জগতে চেয়ারের অস্তিত্ব কল্পনা না করেও চেয়ারের অভিজ্ঞতার কথা বলা যায়। একথার সত্যতা প্রমাণ করা কঠিন নয়। যখন অমূল প্রত্যক্ষ হয় তখন বাইরের জগতে চেয়ার না থাকলেও চেয়ারের অভিজ্ঞতা হয়। সুতরাং বাস্তব জগতে চেয়ারের অস্তিত্ব না থাকলেও চেয়ারের অভিজ্ঞতা সম্ভব হতে পারে। চেয়ারের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাস্তব চেয়ারের অস্তিত্ব কল্পনা করা বাধ্যতামূলক নয়।

বার্কলে তাঁর বিশেষ অর্থে চেয়ার, টেবিল, গাছ, নদ-নদী স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেননি যে চেয়ারের অভিজ্ঞতা বাহ্য জগতে অবস্থিত চেয়ারের দ্বারা উৎপন্ন হয়। বাহ্য জগতে চেয়ার বা টেবিলের মতো বস্তুর অস্তিত্ব নেই। 'চেয়ার', 'টেবিল' প্রভৃতি ভৌতবস্তুসূচক শব্দ ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার পৌনঃপুনিক আকারকে (recurring pattern) বোঝায়, সেই অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত কোন বাহ্য বস্তুকে বোঝায় না। বার্কলে খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন—'If by physical object you mean things existing outside us and causing our sense-experinces, I insist that they do not exist...But if by physical objects you mean groups or complexes of sense-experiences, then they undoubtedly do exist...' ভৌত বস্তু বলতে আমরা যদি এমন কোন বস্তুকে বুঝি যা বহির্জগতে অবস্থান করে আমাদের অভিজ্ঞতার জনক হয়, তাহলে আমি বলব যে তাদের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু যদি ভৌত বস্তু বলতে আমরা ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার দল বা সমন্বয়কে বুঝি তাহলে তাদের অস্তিত্ব আমি অবশ্যই স্বীকার করব।

বার্কলের উপরোক্ত বক্তব্য অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। একটি চেয়ারকে নানা অভিজ্ঞতার গঠনবিন্যাস (pattern) বা নানা অভিজ্ঞতার দলবদ্ধ রূপ বলার অর্থ কি? হসপার্স বলেছেন যে একটি টেবিল হয়তো আয়তক্ষেত্রাকার। কিন্তু আমি যদি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে টেবিলটিকে দেখি তাহলে টেবিলের উপরের আকৃতি পরিবর্তিত হবে। এই বিষয়ে হসপার্স-এর বিশ্লেষণ ও বিচার এইরকম—

১. আমি যদি টেবিল থেকে দূরে চলে যাই তাহলে সেটি আমার কাছে ছোট হয়ে যাবে। আবার যদি টেবিলের কাছাকাছি আসি তাহলে তা আমার কাছে বড় বলে মনে হবে। উপর থেকে যদি দেখি তাহলে টেবিলটি আয়তক্ষেত্রাকার বলে মনে হবে, কিন্তু যদি অন্য কোন দিক থেকে দেখি তাহলে সেটির আকৃতি অন্য-রকম বলে মনে হবে। সুতরাং আমার দৃষ্টিকোণের উপর নির্ভর করে বস্তুর আয়তন ও আকৃতি পরিবর্তিত হয় বলে মনে হয়।

২. আমি যদি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে টেবিলটি একইরকম দেখাবে। কিন্তু আমি যদি স্থান পরিবর্তন করি তাহলে টেবিলটির যে আকার আমার কাছে প্রতীত হয়েছিল তার পরিবর্তন হবে। আবার আগের জায়গায় ফিরে এলে টেবিলটির আকার আগের মতোই দেখায়। এই প্রতীয়মান আকারগুলি কিভাবে পরিবর্তিত হয় তা জানা থাকলে ভবিষ্যতে স্থান পরিবর্তন করলে তার আকার কিভাবে পরিবর্তিত হবে তা আগে থেকেই আমি বলতে পারি। মূল কথা এই যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে টেবিলের যে আকারগত পরিবর্তন আমার কাছে প্রতীত হয় তা সুনির্দিষ্ট এবং সেইজন্যই তা আগে থেকে জানা সম্ভব।

৩. আমি স্থান পরিবর্তন করলে বিভিন্ন ক্ষণের প্রত্যক্ষগুলির মধ্যে সাদৃশ্য দেখতে পাই। আমার বিভিন্ন অবস্থানের মধ্যে যে দুটি স্থান কাছাকাছি সেই স্থান থেকে যে আকৃতি প্রতীত হয় তাদের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য থাকে। তবে অবস্থানগত দূরত্ব বাড়লে প্রথম প্রতীতির সঙ্গে শেষ প্রতীতির সেই সাদৃশ্য আর থাকে না। কিন্তু তাদের মধ্যে থাকে এক ক্রমিক ধারাবাহিকতা।

৪. বিভিন্ন ক্ষণে এবং বিভিন্ন অবস্থান থেকে পাওয়া প্রতীতিগুলির ধারাবাহিকতা নিরবচ্ছিন্ন। কোন বস্তুকে দেখতে দেখতে আমি যখন হাঁটি তখন কোন সময়ই এমন হয় না যে আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে না।

৫. এই প্রতীতিগুলি ভিন্ন ভিন্ন হলেও একটি বিশেষ প্রতীতির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ভিন্ন ভিন্ন বলা হয়। যেমন একটি মুদ্রার গোলাকৃতিটিকে আমরা সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতির কেন্দ্রবিন্দু বলে মনে করি। অন্যান্য অবস্থান থেকে মুদ্রাটির যে আকৃতিগুলিকে পাই তাদের এই কেন্দ্রীয় গোলাকৃতির তুলনায় ভিন্ন বা বিকৃত বলে মনে করি।

৬. যেখানে কোন বস্তুর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা হয় সেখানেই সেই বস্তুর স্পর্শ-সংবেদন হয়। আমি যদি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে টেবিলের দিকে এগিয়ে যাই তাহলে আমার পক্ষে টেবিলটিকে স্পর্শ করাও সম্ভব হবে। চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্পার্শন অভিজ্ঞতার বিশেষ সম্পর্ক আছে, যদিও সবক্ষেত্রে একথা সত্য নয়। আমি যদি না জানি যে আমি আয়নার দিকে তাকিয়ে আছি তাহলে আয়নায় টেবিলের প্রতিচ্ছবির দিকে এগিয়ে গেলেও আমি টেবিলকে স্পর্শ করতে পারব না। আমি শুধু আয়নাটিকেই স্পর্শ করব।

সুতরাং বার্কলের মতে যাকে আমরা টেবিলের আকৃতির অভিজ্ঞতা বলি তা বাস্তবিক নানা ধারাবাহিক অভিজ্ঞতার সমষ্টি। অভিজ্ঞতায় পাওয়া ক্রমিক আকৃতিগুলি একই পরিবারের সদস্যদের মতো একত্র সংলগ্ন থাকে। যাকে আমরা

ভৌত বস্তু (physical object) বলি তা সদৃশ অভিজ্ঞতার সমাহার ব্যতীত আর কিছু নয়—'nothing more or less than a family of sense-experiences.'